রামচন্দ্রকে সার্থক প্রেমিকরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শুধু চোখের জলের বুক ভাসিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। সীতা উদ্ধারের জন্য মন প্রাণ দৃঢ় করে এগিয়ে গেছেন। শবরীকে শাপমুক্ত করে ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীবের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

সার্বিক বিচারে চরিত্রটি কোমলে কঠোরে আকর্ষক হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য ও মাধুর্য একাকার হয়ে গেছে। বীরত্ব, প্রেম, পরিহাসরসিকতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রটি নিঃসন্দেহে 'অমৃতের ভাণ্ড'।

সীতা ঃ কৃত্তিবাসের হাতে সীতা চরিত্রটি সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূর রূপ লাভ করেছে। স্বামীর বনবাসী জীবনের সঙ্গিনী হয়ে সুখে-দুঃখে স্বামীর সম ভাগী হয়েছেন। বাঙলার কোমল-পেলব মাটির গন্ধ চরিত্রটিকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে। পতিভক্তির আদর্শ সীতার জীবনের পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়। রূপে-গুণে তিনি অতুলনীয়া।

'অরণ্যকাণ্ডে' সীতা ছায়ার মতো রামের সঙ্গে বনে বনে ঘুরেছে। অত্রিমুনি আশ্রমে মুনিপত্নীর স্নেহ ভালোবাসায় উদ্বেল সীতার জন্মবৃত্তান্ত পরিবেশন স্নিগ্ধ মধুর। দশবছর নানা বনে ঘুরে পঞ্চবটী বনে এসে সীতা স্বামীকে অনুনয়ের সুরে বলেন—

"সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।"

স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করেই সীতা কথাটি বলেছেন। স্বামী ভক্তির পবিত্রতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। খর-দূষণের যুদ্ধে রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে—

"জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।"

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

স্বর্ণমৃগ দেখে মধুর বচনে সীতা রামকে অনুরোধ করেন—

"এই মৃগ চর্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।"

পত্নীর আশা পূরণে রামচন্দ্রের হরিণ শিকারে যাত্রা এবং মারীচের নকল আর্ত কণ্ঠস্বরে ভীত চকিত সীতার লক্ষ্মণের প্রতি করুণ আবেদনের মধ্যে শুচীশুভ্র প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শূন্য ঘরে সীতাকে একাকী ফেলে সে যেতে অস্বীকার করলে সীতা জ্ঞান শূন্যা হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন—

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের মনে সড় আছয়ে তোমারি।"

এই বক্তব্যের মধ্যে সীতার হীনমন্নতার পরিচয় থাকলেও গভীর ভাবে যদি ঘটনার পরিবেশ ও পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তাই সীতাকে পেয়ে বসেছিল। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে চরম আঘাত না দিলে সে ভ্রাতৃ আদেশে অটল থাকবে এতে রামচন্দ্রের চরম বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাতেই সীতা কথাগুলি বলেছেন। এসব তাঁর মুখের কথা মনের কথা নয়।

অতিথি পরায়ণ সীতা আতিথ্য নিষ্ঠার জন্যই লক্ষ্মণের আদেশ অমান্য করে গণ্ডীর বাইরে এসে রাবণের হাতে

বন্দিনী হন। অনেকে একে হঠকারী বলে চিহ্নিত করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় বাঙালির চিরন্তন আতিথেয়তার আদর্শেই সীতা এমনটি করেছেন। রাবণ সীতাকে আকাশ পথে নিয়ে যাবার দৃশ্যে হীনমন্ন রাবণের প্রতি সীতার তীব্র ঘৃণা ও স্বামীর প্রতি অনন্ত প্রেমাশ্রু ঝরে পড়েছে। গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আবেদনে আমার স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনাতুরা সতি-সাধ্বী-মহিয়সী নারীর রূপটিই প্রত্যক্ষ করি। পথ রেখা ধরে রামচন্দ্র যাতে অনুসন্ধানী হতে পারেন তার জন্য সীতা তাঁর গায়ের গহনাদি পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের শত প্রলোভন সীতা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর কণ্ঠে এক বাণী—

"রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।"

এই অংশেই সীতার পতিব্রত্যের নৈষ্ঠিক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। অশোককাননে বন্দিনী সীতা নীরব নিথর।

"সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্বদা রাম মলিন নয়নে।।"

বিরহ অনলে সীতা চরিত্রটি প্রেম পবিত্ররূপ ধারণ করেছে।

লক্ষ্মণ ঃ শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাসী জীবনে ছায়াসঙ্গী ছিল লক্ষ্মণ। কৃত্তিবাসের হাতে 'অরণ্যখণ্ডে' লক্ষ্মণ শুধু রামচন্দ্রের ছায়া নয় কায়ারূপও ধারণ করেছে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্তে দুর্বল অসহায় রামের মনে শক্তি ও আশা স্বপ্ন জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, ভ্রাতৃভক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সীতার কটূক্তির প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজেকে সংযমের শাসনে বেঁধে সীতার নিরাপত্তা বিধানে কার্পণ্য করেনি। ধীর-স্থির অটল-স্বল্পভাষী লক্ষ্মণের চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস দু-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে এঁকেছেন।

দণ্ডকারণ্যের পথে আগে রাম মধ্যে সীতা ও পিছনে লক্ষ্মণ পথ চলছে। তিনজনে প্রকৃতির কোলে আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় ভীষণ রাক্ষণ বিরাধের আগমন। সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে সে ভক্ষণ করতে চায়। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকেও সে হত্যা করতে উদ্যত। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে রাম ভীত হয়ে পড়েন। তাঁদের সামনে সীতাকে রাক্ষস গিলে খাবে অথচ নিরুপায়ভাবে তা দেখতে হবে এই ভাবনায় রাম যখন দিশেহারা, তখন লক্ষ্মণ দাদার মনোবল ফেরাতে—

"লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।"

লক্ষ্মণের এই উদ্দীপন মন্ত্রেই রামের শৌর্য-বীর্যের জাগরণ ঘটে। সুতরাং চরম সঙ্কট মূহূর্তে লক্ষ্মণকে আমরা দৃঢ়চেতা যুবকরূপে দেখতে পাই। অগস্ত্য মুনির লক্ষ্মণ সম্পর্কে মন্তব্য—

"দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।"

লক্ষ্মণ চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন। রাম-সীতার সুখ-দুঃখের সমঅংশভাগী সে। আত্মসর্বস্বতার কোনো মলিনতা চরিত্রটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। লক্ষ্মণের পরামর্শেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র কুটীর নির্মাণ করেন। দাদার স্বপ্নকে সে একদিনে সুন্দর কুটীর তৈরী করে সার্থক করে। তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ। কুটীর সম্পর্কে কবির 'মনোহর' শব্দটি এবং 'পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি'—এই বর্ণনা তার সাক্ষ্য বহন করে।

খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের সহযোগী যোদ্ধার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে লক্ষ্মণ। 'ভয়' শব্দটি তার চরিত্র অভিধানে লেখা নেই। পরিহাস করে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বল্লে সূর্পণখা তার দিকে ধাবিত হয়ে শৃঙ্গার রস ঢেলে দেয়।

লক্ষ্মণ নিজেকে 'শ্রীরামের দাস' বলে তাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্পনণখা বাড়াবাড়ি করে সীতাকে গিলে খেতে গেলে রামের ইঙ্গিতমাত্র বাণ দিয়ে তার নাক কান কেটে দেয়। একদিকে ভ্রাতৃভক্তি অন্যদিকে দুষ্টকে শায়েস্তা করা —দুটি কাজ লক্ষ্মণ করে তার চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে।

মারীচের ছলনায় ভুল বুঝে সীতা লক্ষ্মণকে অশালীন ভাষায় গালাগালি ও রুচিহীন ইঙ্গিত করলেও—

"লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।"

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের নিষ্পাপ চরিত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও কর্তব্য কর্মে তার অবহেলা নাই। তাই সীতাকে সাবধান করে গণ্ডী একে দিয়ে যায়। এর মধ্যে তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা না বুঝে পরিস্থিতি অজ্ঞাত থাকার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে একাকিনী ফেলে আসার জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করলেও সে নিরুত্তর থাকে। বুক ভরা জ্বালা নিয়েও তার কর্তব্য জ্ঞান ও সংযমের জন্য চরিত্রটি আদর্শস্থানীয় হয়েছে। কবন্ধের দুই-হাত ছিন্ন করার ব্যাপারে লক্ষ্মণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তার আহ্বানেই কবন্ধ মুক্তি পাবার পর সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের কাছে তাদের যাবার নির্দেশ দেয়।

সুতরাং লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস স্বল্প স্থানের মধ্যে রেখেও অসামান্য করে তুলেছেন। ভ্রাতৃভক্তি, বৌদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, চরম বিপদে স্থির থেকে বুদ্ধি দান, সাহসীও সংযমী ভূমিকা পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণ নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হয়েছে।

রাবণ ঃ কৃত্তিবাসের অরণ্যকাণ্ডের শেষের দিকে আমরা লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখতে পাই। সূর্পণখা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতি দৈহিক কামনা-বাসনা-সঘন প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তার নাক, কান কেটে দিলে খর-দূষণকে উত্তেজিত করে চোদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আতঙ্কে দিশেহারা প্রতিশোধের শেষ অস্ত্র হিসাবে সূর্পণখা রাবণকে বেছে নেয়।

রাবণ-রাজ সভায় আসীন। বিভৎস মুখ নিয়ে সূর্পণখা রাবণকে প্রথমে গালাগালি দেয় তারপর রামের বন গমন ও রাক্ষসদের হত্যার বিবরণ দিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করে—

"রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে পরমা কামিনী।"

এখানেই শেষ নয়। সীতার সৌন্দর্য্যের কাছে স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী, মেনকা, রম্ভাও হার মানে। শেষে রাবণের কামনা আগুন জ্বালতে বলে—

"তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।"

সূর্পণখার দুরবস্থায় রাবণ বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সে 'সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে'। এই একটি চরণেই কৃত্তিবাস কামুক রাবণের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। রূপবতী সীতাকে তার চাই। মনে মনে পরিকল্পনা গ্রহণ করে মারীচের কাছে সূর্পণখার নাক কান কাটার কথা বলে সীতাহরণের জন্য মারীচকে হরিণ সেজে রামকে মায়াজালে জড়িয়ে ফেলতে

বলে। মারীচ তাকে অনেক সুমন্ত্রণা দেয়, এমনকি এই কু-কর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হবে এমন কথাও বলে। কিন্তু রাবণ সব মন্ত্রণা নস্যাৎ করে মারীচকে তার আজ্ঞা পালন করতে বলে নতুবা তার মৃত্যু অনিবার্য একথাও বলে।

নিরুপায় মারীচ রাবণের নির্দেশে সোনার হরিণ সাজে, সীতাকে প্রলুব্ধ করে, রামকে কুটীর থেকে অরণ্যে আনে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে সীতাকে প্রতারিত করে লক্ষ্মণকেও কুটীর ছাড়তে বাধ্য করে। রাম-লক্ষ্মণ শূন্য কুটীরে একা সীতা। তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ মিষ্টি মধুর কথায় সীতার মন ভেজায়। নিজের কথা বলে ভিক্ষা চায়। সীতা ইতস্ততঃ করতে থাকলে তার বজ্র নির্ঘোষ—

"..... ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।"

আতিথেয়তার ধর্ম নষ্ট হবে বলে লক্ষ্মণের কথা উপেক্ষা করে গণ্ডী পেরোতেই ছদ্মবেশী রাবণের আসল চেহারাটা প্রকাশ পায়। কৃত্তিবাসের ভাষায় 'রাবণ পাতকী'। সীতার মনহরণের জন্য স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যের জগতকে তার সামনে তুলে ধরে নির্লজ্জের মতো বলে—

"সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।"

সূর্পণখা দাদার কামুক চরিত্রের যে আভাস দিয়েছিল তা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় রাবণের এই নগ্ন ইচ্ছার মধ্যে। জটায়ু পাখী সীতা হরণের জন্য রাবণের উদ্দেশে কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু সুচতুর রাবণ নিজের কামাগুণের কথা চেপে সূর্পণখার প্রতি রাম-লক্ষ্মণের নৃশংস ব্যবহার, খর-দূষণের নিষ্ঠুর মৃত্যু ইত্যাদির কথা অনুনয়ের সুরে বলে, পক্ষীরাজের কাছে পরাজয় মেনে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে কোনোক্রমে ভাঙ্গা রথ নিয়ে লঙ্কায় আসে। সীতার সঙ্গে, জটায়ুর সঙ্গে রাবণ যে অভিনয় করেছে তাতে তার চাণক্যীয় কূট-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। চতুর কামুক রাবণ অশোক কাননে সীতাকে বন্দিনী রেখে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কৃত্তিবাসের হাতে রাবণ পাপিষ্ঠ, ছল-চাতুরী পূর্ণ কামুক রূপেই চিহ্নিত।

সূর্পণখা ঃ পঞ্চবটী বনে সূর্পণখার আবির্ভাব। 'মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী'—রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে রূপজ মোহে তাকে জীবনসঙ্গী করে ভোগসুখে মগ্ন হতে চায়। সীতা লক্ষ্মণের পরিচয় দিয়ে এবং বনবাসী হওয়ার কারণ জানিয়ে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে এড়াতে চায়। খর-দূষণ দুই ভাই এর কথা বলে সে নগ্নভাবে রামচন্দ্রকে প্রস্তাব দেয়—

"সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমাসহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।"

শুধু তাই নয় সীতাকে ভক্ষণ করে একা রামের সঙ্গিনী হবে বলে। রামচন্দ্র কৌতুক বলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলে সে নির্লজ্জের মতো তাকে বলে—

"তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।"

কৃত্তিবাস দেহ সম্ভোগী সূর্পণখার চরিত্রটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। কামনা-বাসনার স্বপ্ন ব্যর্থ হলে—নাক,

কান কাটা গেলে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে সে খর-দূষণকে যুদ্ধে পাঠায়। তাদের মৃত্যুর পর রাবণকে নরমে-গরমে, চোখের জলে নানা অভিনয় করে সীতা হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় নিজের কামাগ্নিকেই সে ছড়িয়ে দেয় রাবণের চিন্তায় ভাবনায়।

সুতরাং দেখা যায় সূর্পণখা চরিত্রটি অরণ্যকাণ্ডে সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত। স্বাধীন প্রেম শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ। কিন্তু সূর্পণখার নগ্ন প্রেম নিবেদন ঘৃণার্হ। লক্ষ্মণ তার নাক-কান কেটে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। লঙ্কাপুরী যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তার মর্ম মূলে সূর্পণখার কামনার অনল অন্যতম। সে এই অনলই প্রজ্জ্বলিত করেছে রাবণের হৃদয়ে।

মারীচ ঃ 'অরণ্যখণ্ডে' মারীচের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও দুঃখ দুই-ই জাগে। সুবিবেচক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নিরুপায় মারীচ করুণার পাত্র। সীতাহরণের কামনা পূর্ণ করতে রাবণ মারীচের গুণগানে মুখর হলেও সে তার প্রস্তাবকে মনে প্রাণে সমর্থন করেনি। ন্যায়-অন্যায় বোধে চরিত্রটি উদ্দীপিত। সে স্পষ্ট ভাষায় রাবণকে সুমন্ত্রণা দিয়ে বলে—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।"

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'—রাবণ নাছোড়বান্দা। সে মারীচকে কু-কর্মে সহযোগী হতে বলে, না হলে তার মৃত্যু অনিবার্য বলে ভয় দেখায়। কিন্তু মারীচ মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। তবে এই মৃত্যু রাবণের হাতে নয় রামচন্দ্রের হাতেই তার কাম্য। তাই আমরা শুনতে পাই মারীচের মর্ম কথা।

"বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।

পাপ-পুণ্য বোধ চরিত্রটিকে অসামান্য মর্যাদা দান করেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে রাবণের নির্দেশ মেনে ছলা-কলা নিতে হয়েছিল, যার পরিণামে সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ ও লঙ্কাপুরী ধ্বংস। মারীচের আত্মত্যাগ যেন লোভ ও পাপের উচিত ফল প্রাপ্তির নির্দেশক। মারীচের শত ছলা-কলা, সীতার অপহরণ ইত্যাদির জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে মারীচকে দায়ী বলে মনে হলেও কৃত্তিবাস মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মারীচকে উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

৪৪.৭ অরণ্যকাণ্ডের বিশেষ-বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ

(ক) অত্রিমুনি পত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন, (খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ, (গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা, (ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

এই অংশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রন্থের 'অরণ্যখণ্ডে'র বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এই অংশগুলি পাঠ করলে অন্যান্য প্রধান বা অপ্রধান অংশগুলি ও মূল-পাঠ দু-তিনবার পাঠ করে আপনারা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজের ভাবনা ও প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য অংশগুলি বিশ্লেষণ করা হল।

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে মুনিপত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন ঃ

চিত্রকূট ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে রামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে সমাদরে স্থান পাবার পর মুনি,

সীতাদেবীকে তাঁর পত্নী গৌতমীর হাতে সমর্পণ করেন। মুনি-পত্নীকে দেখে সীতার মনে হয় 'মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'

সীতাকে প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ করে মুনিপত্নী তাকে মুখোমুখী বসিয়ে সস্নেহে মধুর কথা বলতে শুরু করেন।

সীতাদেবীর ভাগ্যপ্রসন্ন। পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ই রাজকুল। দুই বংশকেই সীতা উজ্জ্বল করেছেন। রামচন্দ্র বহু তপস্যা করে এমন স্ত্রী লাভ করেছেন। রাজ সম্পদের মোহত্যাগ করে সীতা স্বামী সঙ্গিনী হয়ে বনবাসিনী হয়েছেন। সীতার গুণগান মুনিপত্নী পঞ্চমুখে করলে, সীতা বিনয়ের সঙ্গে বলেন—

'ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।"

স্বামী ভক্তির পরম নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে মুনিপত্নী আনন্দে আত্মহারা। তিনি সযত্নে তাঁকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে আদরে আলিঙ্গান করে সীতাকে তাঁর পূর্ব জীবনের ঘটনা বলতে বলেন। সীতা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

স্বর্গের অপ্সরা মেনকা আকাশপথে যাবার সময় তার বস্ত্র উড়ে যায়। তার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে জনক রাজার কামনাবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং তার বীর্যের স্খলন হয়। সেই বীর্য মাটিতে পড়ে এবং তা থেকেই সীতার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙ্গালের ফলায় সীতার দেহ সূর্য্যের আলোতে আসে। নিজের কন্যা অনুমান করে জনক রাজা তাকে কোলে স্থান দেন। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হয়। এই দৈববাণীতে সীতার জন্ম কাহিনী পিতা জানতে পারেন। লাঙ্গালের মুখে জন্ম বলে নাম রাখলেন সীতা। আনন্দে আত্মহারা রাজা দীন-দুঃখীদের অকাতরে ধন দান করেন। রাজমাতার স্নেহে সীতা বড় হন। যে শিবের ধনুকে গুণ পরাতে পারবে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন বলে মনে মনে স্থির করেন। রাজার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেরো লক্ষ রাজকুমার এসে উপস্থিত। কিন্তু সবাই ধনুক দেখে ভয় পায় এবং মনের দুঃখে স্থান ত্যাগ করে। জনকরাজা দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতি। শ্রীরামচন্দ্র বাম হাতে ধনুক তুলে তাতে গুণ পরাতে গেলে শিবধনুক ভেঙ্গে যায়। ধনুক ভাঙ্গার শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পরই মহা ধূমধামের মধ্য দিয়ে রাম-সীতা ও কুশধ্বজের দুই মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণ ও ভরতের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পূর্বকথা শেষ করে বিনয় নম্রভাবে সীতা বলেন—

"ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।।"

সীতার কথায় পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিপত্নী সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দেন আর তার সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে নববেশে নবরূপে সাজিয়ে দেন।

সীতা ও মুনি পত্নীর কথোপকথনে আমরা অত্যন্ত আপনজনের হৃদি বিনিময় দেখি। রাজদুহিতা রাজপত্নীর বনবাসিনী মূর্তি গুরু পত্নীকে ব্যথা দেয়—এজন্যই তিনি তাকে অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রথম দর্শনেই মুনি পত্নীকে সীতার করুণারূপিনী মনে হওয়ায় প্রাণখুলে তিনি তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সীতার বনবাসিনী রূপ দেখে মুনিপত্নীর কথায় বেদনা প্রকাশ পেলে সীতা তার পতিভক্তির প্লাবনধারায় সে বেদনা দূর করে দেন। উভয়ের কথোপকথন যেমন আন্তরিক তেমনি হৃদিরসে জারিত।

(খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ ঃ পঞ্চবটী বনে দীর্ঘদিন বাস করে সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছে অগস্ত্যমুনির নিকট যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মুনি পিপ্পলী বনে গিয়ে অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। অগস্তোর তপোবনে গিয়ে বাতাপি ও

ইল্বল রাক্ষসকে অগস্ত্য মুনি কিভাবে বধ করেছিল সে কাহিনী শুনায়। তারপর মুনির দ্বারা তাঁরা তিনজন উপস্থিত হন। রামের কথা শুনে মুনি শিষ্যকে শীঘ্র তাঁদের ডেকে আনতে বলে। তিনজন অগস্ত্যের চরণ বন্দনা করে। গোলোক ছেড়ে রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছেন। তাঁর আর কি ইচ্ছা তা মুনি জানতে চান। শ্রান্ত বনবাসীদের ভোজনে তৃপ্ত করে। তিনদিন সেখানে তাঁর থাকার পর চতুর্থদিন ভোরে রামচন্দ্র অগস্ত্যের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললে, অগস্ত্য মুনি তাঁকে গোদাবরী তীরে থাকতে বলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বিশ্বকর্মা নির্মিত 'দিব্য ধনুর্ব্বান' প্রদান করেন। রামচন্দ্রকে 'সোনার টোপর' ও 'বস্ত্র রত্ন' দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। অগস্ত্য মুনির আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর নির্দ্দেশেই রাম-লক্ষ্মণ সীতা অগস্ত্যমুনির তপোবন ত্যাগ করে। দক্ষিণ দিকে গোদাবরী নদীর তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই অংশে রামচন্দ্রের ভগবৎরূপ অগস্ত্যমুনি জানতে পারেন। পিতৃসত্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যাতে নির্ভাবনায় আনন্দে থাকতে পারেন তার জন্যই মুনির 'দিব্য-ধনুর্ব্বান' দান এবং গোদাবরী নদীর রমণীয় তীরে কুটীর নির্মাণ করে বসবাসের নির্দেশ দান।

(গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা দান ঃ

সূর্পণখার কাছে সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে রাবণ কামনার আগুনে জ্বলে সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য চায়। কিন্তু মারীচ স্পষ্টভাবে বলে—

'সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর'

রাবণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় রাবণ ভীষণ রেগে যায় এবং তাকে বলে—

'আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।'

রাবণ নিজের প্রতাপের কথা সদম্ভে ঘোষণা করে এবং রামচন্দ্রকে হীন মনুষ্যজাতিরূপে তাচ্ছিল্য করে। মারীচের কাছে রাবণ জোরের সঙ্গে বলে—

"ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পূর।"

বারণের কু-প্রস্তাব ও তাকে হত্যা করার হুমকী অগ্রাহ্য করে মারীচ বলিষ্ঠভাবে পরিণাম সম্পর্কে বলে—

'সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।' রাবণ জীবনে অনেক নারীকে হরণ করেছে, কিন্তু সীতাকে হরণ করলে তার আর নিস্তার নেই। শুধু রাবণ নয়, লঙ্কাপুরীর সকলের জীবনও হবে সংশয়। একজনের স্ত্রীকে এনে সকল নারীর মর্যাদা নষ্ট হবে। তাই মারীচ রাবণকে সীতার লোভ ত্যাগ করার কথা বলে লঙ্কাপুরীতে ফিরে যেতে বলে। রামচন্দ্রের মুখোমুখি হয়ে আগে মারীচের মৃত্যু হবে কিন্তু সীতা হরণের পর রাবণ ও লঙ্কাপুরীর সকলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করে রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে বনে আনতে পারবে, কিন্তু সীতাকে রক্ষার জন্য দেবর লক্ষ্মণ কুটীরে থাকবে। লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে কারো সাধ্য নেই সীতাকে হরণ করে। সুতরাং মারীচের সুমন্ত্রণা দান—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।"

শুধু তাই নয় মারীচ শেষবারের জন্য বলে যে তার মন্ত্রণা উপেক্ষা করে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করে তবে মারীচের ভবিষ্যৎবাণী তাকে স্মরণ করতেই হবে। অর্থাৎ তার ও দেশবাসীর মহা সর্বনাশ ঘটবে।

মারীচ যুক্তিসহ মানবিক সুমন্ত্রণাই দিয়েছে রাবণকে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে রাবণের কু-পরামর্শে ভীরু কাপুরুষের মতো তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি। বরং সীতার লোভ ত্যাগ করে, ভবিষ্যৎ এর সর্বনাশের কথা ভেবে যাচ্ছে রাবণ কু-ইচ্ছা দমন করে তার জন্যই তাকে এই সৎ পরামর্শ দান। এর মধ্য দিয়ে মারীচের নির্ভীক আদর্শবাদী চারিত্রিক মাধুর্যই প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে'র শেষ অংশটি 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ' রূপে চিহ্নিত।

ধনুর্বাণ হাতে রামচন্দ্র কুটীরে যাত্রা করেন। পথে অমঙ্গলের বহু চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ে। মারীচের রামকণ্ঠের আহ্বানে লক্ষ্মণ কি সীতাকে একাকিনী রেখে বনে আসবে? যদি আসে তবে সীতার কি হবে?—এইসব চিন্তায় মগ্ন অবস্থাতেই পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই রামচন্দ্রের প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাঁর কণ্ঠে মহা বিপদের সংকেত—

"মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।"

ভাই লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের বক্ষভেদী বিলাপ—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

দুরন্ত রাক্ষস পরিবৃত্ত এই গভীর বনে মুনি ঋষিগণ সর্বদা শঙ্কাতুর। লক্ষ্মণ সব জেনে শুনেও যে কাজ করেছে তার ভবিতব্য ভেবে রামচন্দ্র নিজের অদৃষ্টকেই বার বার দোষারোপ করতে থাকেন। মারীচ বধের দৃশ্য দেখিয়ে ভাইকে নিয়ে রামচন্দ্র দ্রুত কুটীরের দিকে গমন করেন। কুটীর দ্বারে পৌঁছে তার বুক ফাটা "সীতা-সীতা" ডাক। কোনো উত্তর নেই। কুটীর সীতা শূন্য দেখে তিনি মুর্চ্ছিতপ্রায় হন। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র কিভাবে বাঁচবে—সীতাকে না পেলে প্রাণত্যাগ করবে ইত্যাদি বিলাপ করতে থাকেন। বন-গুহা, তরুমূল তন্ন তন্ন করে খুঁজে সীতাকে না পেয়ে রামচন্দ্র চোখের জলে বুক ভাসান। তাঁর কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদে। সীতার শোকে রাম অস্থির। তবু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্মণকে মুনি-পত্নীর কাছে, গোদাবরী তীরে খুঁজতে বলে।

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতাবিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

ফণী ছাড়া সাপের জীবন যেমন ব্যর্থ, তেমনি সীতাহারা রামচন্দ্রের জীবনও অন্ধকার। লক্ষ্মণ ভাই-এর প্রতি তাঁর করুণ আবেদন—

"দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।"

পথে সীতার অলঙ্কারাদি, রাবণের রথচূড়ার অংশাদি দেখে ঐ স্থানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বলেন রামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপে বন-বনানী বেদনায় দীর্ণ। হঠাৎ সামনে আহত জটায়ু পাখীর সঙ্গে দেখা, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং তার নির্দ্দেশে রাম-লক্ষ্মণের সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মূল লক্ষ্য সীতা উদ্ধার।

এই অংশে পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সীতাহারা রামচন্দ্রের বিলাপ করুণ রস ধারায় স্নাত।

৪৪.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দুশো বছরের অধিককাল সাহিত্য অজ্ঞানে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ তুর্কী আক্রমণ, মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং তার অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই পশ্চিমবঙ্গকে তুর্কি শাসনের কবলে তুলে দেন। শুরু হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তের প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কি শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে—এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশি শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য ও অন্তর্শায়ী বিদ্যোৎসাহিতার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৬৯ খ্রিঃ — ১৪৭৩ খ্রিঃ) হুসেন শাহ (১৪৯৩ খ্রিঃ — ১৫০০ খ্রিঃ) এবং তার পুত্র নসরৎ খাঁ (১৫১৮ খ্রিঃ — ১৫৩২ খ্রীঃ)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন "এ বঙ্গের অলঙ্কার" কৃত্তিবাস ওঝা।

কবি পরিচিতি ঃ কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হল।

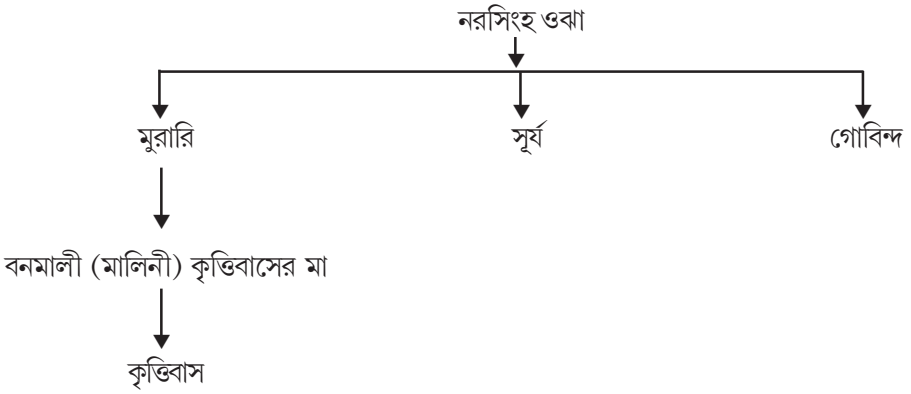

কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।।"

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন তেরশ কুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ -এর ১৬ ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২ - ১৪৩৩ খ্রিঃ কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দন জলে অভিষিক্ত করেন। মাল্যভূষিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন কিন্তু অবাক কাণ্ড লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথায় উল্লেখ করেন নি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজ গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিঃ। যদি কবির জন্ম ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গল বিবৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইতি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "কৃত্তিবাস, মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হন, সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।"

কাব্য পরিচিতি ঃ পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মতো করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হল—'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য', 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'লঙ্কা' ও 'উত্তরা'। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরল উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে

সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল কৃত্তিবাসের হতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল পেলব মাখানো বাঙালি চরিত্রের মতো হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-করুণাঘন 'মূর্তি' কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্যে দিয়ে অভিমানক্ষুব্ধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তিরসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শূরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী' কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কেমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, "কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান— বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজন রসিকতা, আলস্য পরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে এসবের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের উদ্বেলতাও লক্ষ্যণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিল—মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাপড় ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধুর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ :

"প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।"

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠী পূজা', তোরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর, করুণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্র বধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্লুত করেছে। সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরস ভরায় গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মতো চিরকাল আস্বাদন করবেন।

কৃত্তিবাসের নামে এমন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালক্রমে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে

১৮০২ খ্রিঃ — ১৮০৩ খ্রিঃ -এর মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। ১৮৩০ খ্রিঃ — ১৮৩৪ খ্রিঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

৪৪.৯ অনুশীলনী

১। নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ ৫টি খণ্ডে লিখিত।	☐	☐
(খ) রামচন্দ্র পম্পা নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করেন।	☐	☐
(গ) রামচন্দ্রকে দিব্য ধনুর্বান প্রদান করেন অগস্ত্যমুনি।	☐	☐
(ঘ) যুদ্ধে খর-দূষণের হাতে রামচন্দ্র পরাজিত হন।	☐	☐
(ঙ) মারীচ রাবণকে সুমন্ত্রণা দেয়।	☐	☐
(চ) রামচন্দ্র সূর্পণখার নাক-কান কাটে।	☐	☐
(ছ) রামচন্দ্র আগে পঞ্চবটী বনে পরে চিত্রকূটে যান।	☐	☐
(জ) রামচন্দ্রের হাতে বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ঘটে।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) কৃত্তিবাসের কাব্য ——— গ্রন্থ।

(খ) অরণ্যকাণ্ডের প্রকৃতি চিত্র ———।

(গ) রামচন্দ্রের বিলাপ অংশে ——— রস প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) রাবণ চরিত্রটি ———।

(ঙ) সীতা ——— বাঙালি বধূ হয়েছেন।

(চ) জটায়ু ——— যুদ্ধ করে।

(ছ) খর ও দূষণ রাবণের ———।

(জ) সীতা ——— রাজের কন্যা।

(ঝ) রামচন্দ্র ——— ভেঙে সীতাদেবীকে বিবাহ করেন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লিখুন।

(ক) 'শূন্য বনে কেমনে রহিব তিন জন'।
কে, কোন, বনের কথা বলেছেন? 'তিনজন' কে কে?

(খ) 'মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'
কে, কোথায়, কাকে দেখে একথা ভেবেছিলেন?

(গ) "নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।"
এই প্রকৃতি চিত্র কোথাকার?

(ঘ) 'মেঘের গর্জন যেন ছাড়ে সিংহনাদ।'
এখানে কার গর্জনের কথা বলা হয়েছে?

(ঙ) অগস্ত্যমুনি কোন্ দুই রাক্ষসকে নিঃশেষ করে?

(চ) কোন মুনির আশ্রমে রামচন্দ্র ইন্দ্রের ধনুর্বাণ পান?

(ছ) 'সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।'
কথাটি কে, কাকে, কখন বলেছে?

(জ) 'রণধ্বজ ভাঙিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।'
কেস কার রণধ্বজ ভাঙে এবং কেন?

(ঝ) 'সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।'
কে, কখন, কার কাছে একথা বলেছেন?

৪। নীচের কাব্যাংশগুলির ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিখুন।

(ক) 'দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।"

(খ) 'দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান।।"

(গ) "পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটিপালটি যত গোদাবরী তীর।।"

৫। ৩.৬ একক পাঠ করে নীচের চরিত্রাদির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১০ টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, রাবণ।

৬। অনুবাদক কৃত্তিবাসের কবি পরিচিত ও অনূদিত রামায়ণ কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভার দিকটি নিজের ভাষায় আলোচনা করুন ১০ টি বাক্যের মধ্যে।

৭। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষেপে লিখুন।

৪৪.১০ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক।

২। (ক) অনুবাদ, (খ) মনোহর, (গ) করুণ, (ঘ) দেহভোগী, (ঙ) সর্বংসহা, (চ) বীরের মতো, (ছ) দুই ভাই, (জ) জনক, (ঝ) হরধনু।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর সূত্র ঃ (ক) রামচন্দ্র, চিত্রকূট পর্বত, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। (খ) সীতা দেবী, অত্রিমুনির আশ্রম, মুনিপত্নী। (গ) দণ্ডাকারণ্যের, (ঘ) বিরাধ, (ঙ) বাতাপি ও ইল্বল। (চ) শরভঙ্গামুনির আশ্রম, (ছ) মারীচ, রাবণ, সীতাহরণ ষড়যন্ত্র মুহূর্ত, (জ) জটায়ু, রাবণ, সীতাহরণের জন্য, (ঝ) রামচন্দ্র, শূন্য কুটীর, লক্ষ্মণের কাছে।

৪। ব্যাখ্যার সংকেত সূত্র ঃ

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সীতাদেবী মুনিপত্নীকে দেখে অভিভূত হন। তাঁর সৌম্য-স্নিগ্ধ মধুর করুণা নিষিক্ত চেহারা ও মাতৃসম ব্যবহার দুর্লভ। আলোচ্য গুণাবলীর দ্বারা মুনিপত্নী যেন করুণামূর্তি লাভ করেছেন। প্রীতি প্রেম করুণা রূপিনী মুনিপত্নী সীতার কাছে সর্ব শ্রদ্ধেয় রূপে দেখা দিয়েছেন।

(খ) আলোচ্য কাব্যাংশটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের 'অরণ্যকাণ্ডে'র বিরাধ বধ অংশ থেকে উদ্ধৃত। এখানে কবি বিরাধের ভয়ংকর মূর্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। অত্রিমুনির আশ্রমে যাবার পর মুনির নির্দেশ রামচন্দ্র দণ্ডক কাননে গমন করেন। সেই বনে বিরাধ রাক্ষসের বাস। এই রাক্ষসের আকৃতি বিরাট। বিশাল শক্তিধর। কবি তার উচ্চতা ও দৈহিক শক্তিকে পর্বতের তুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মতো। শক্তির মদমত্ততা ও চেহারার ভয়ংকরতা আলোচ্য অংশে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(গ) কুটীরে সীতা দেবীকে না দেখে রামচন্দ্র দিশেহারা হন। ভআই লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনের প্রতিটি স্থান, প্রতিটি গাছের তলা তন্ন তন্ন করে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ান। গোদাবরী তীরের স্মৃতিমধুর স্থানগুলি ব্যাকুল হয়ে সীতার অনুসন্ধান করেন। অজানিত আশঙ্কায় রামচন্দ্রের ব্যাকুল হৃদয়ের করুণ রূপটি আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। রামচন্দ্র ঃ বাল্মীকি মুনি রামচন্দ্রকে বীরচরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁকে ভক্তের ভগবানরূপে চিত্রিত করলেও অরণ্যখণ্ডে আমরা তাঁকে বীর ও প্রেমিকরূপে পাই। ভ্রাতার প্রতি অসীম স্নেহ, সীতার প্রতি অনন্ত প্রেম উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মুনিদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব তুলনাহীন। সূর্পণখার সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর রস-রসিক মনের পরিচয় পাই।

রামচন্দ্রের পত্নী-প্রেম রোমান্টিক মাধুর্যে ভরা। গোদাবরী তীরের কুটীরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে রামচন্দ্রের আকুল-ব্যাকুল আর্তি করুণ-সুন্দর। চরিত্রটি কোমলে-কঠোরে, শৌর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ। রামচন্দ্রের চরিত্রে বাঙালি জীবনছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। সর্বগুণে ভরা চরিত্রটি সত্যই 'অমৃতের ভাণ্ড।'

(ঘ) **সীতা ঃ** কৃত্তিবাস সীতাদেবীকে সর্বংসহা বাঙালি গৃহবধূরূপে অঙ্কিত করেছেন। বিনয়নম্রা, ভক্তিস্নাতা সীতা অনন্যা। পতিভক্তির আদর্শ সীতাকে অনন্ত প্রেমের পূজারিণী করেছে। পতির জীবন আশঙ্কায় আকুল সীতা লক্ষ্মণকে অনেক কটুকথা বললেও পতিব্রত্যের উজ্জ্বল আলোতেই তা ভাস্বর হয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ আতিথেয়তায় উদ্দীপ্ত হয়েই তাঁকে বিচ্ছেদের দহন জ্বালা সইতে হয়েছে। রাবণের দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে চরম বিপদ মূহুর্তেও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

একদিকে রাবণের প্রতি ধিক্কার অন্যদিকে পতিমিলনের জন্য উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ। পথে প্রান্তরে গায়ের অলংকারাদি ছড়িয়ে ফেলার মধ্যে তা দেখা যায়। অশোক কাননে শোকানলে দগ্ধ হয়ে সীতার প্রেম পবিত্র রূপটি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রাবণ ঃ লঙ্কেশ্বর রাবণের চরিত্রটি কৃত্তিবাস রূপমোহগ্রস্ত বিবেকশূন্য, ভোগবাদীরুপে অঙ্কন করেছেন। ভগিনীর নাক-কান কেটে ফেলার জন্য সে মোটেই দৃষ্টি দেয় নি। সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনেই তার ভোগলিপ্সা জেগে ওঠে। সীতা হরণের কথা শুনে মারীচ রাবণকে অনেক সুপরামর্শ দেয়, এমন কি এই অপকর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু পাপী দেহলোভী রাবণ তাতে কর্ণপাত করে নি। বরং তাকে হত্যা করার ভয় দেখায়। এতেই প্রমাণিত যে চরিত্রটি অত্যন্ত নীচুস্তরের। ছল-চাতুরীতেও সে ওস্তাদ। মারীচকে সোনার হরিণের ছদ্মবেশ ধারণের পরামর্শ, তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ, অতিথি সৎকারের ঐতিহ্য ইত্যাদি কূট-কৌশল অবলম্বনেও সে পারদর্শী। জটায়ু পাখীর কাছে সূর্পণখার প্রসঙ্গ এনে ক্ষমাপ্রার্থীর অভিনয় করে। চতুর, কামুক রাবণ চরিত্রটি কৃত্তিবাস সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাড়ী করেন। কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী ও মাতা মালিনী। কবির দেওয়া জন্মবৃত্তান্তের নানা ব্যাখ্যা দেখা যায়। ১৪৩২ — ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতাও সর্ববাদী সম্মত নয়। নানামুনির নানামত থাকা সত্ত্বেও কবি রাজা গণেশের সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর আদেশকে পাথেয় করে বাল্মীকির প্রসাদে তিনি 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। যা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে সুপ্রচারিত।

সহজ সরল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনী অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই সংগত। তাঁর রচিত গ্রন্থের ৭টি কাণ্ড হলো—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরা। মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ কবি যেমন বাদ দিয়েছেন, তেমনি পুরানো উপাখ্যান থেকে অনেক সরস কাহিনী যোগ করেছেন। তাঁর কাব্যখানি গল্পরসে জম-জমাট। কৃত্তিবাসের হাতে রামায়ণের বলিষ্ঠ মহাকাব্যিক চরিত্র কোমল-মধুর-বাঙালি চরিত্র হয়েছে। অরণ্যখণ্ডের রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চরিত্রে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাতে বীরধর্মী কাব্য হয়েছে 'গৃহধর্মী।' কৃত্তিবাসের রামায়ণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাঙালির হৃদয়ের কাব্য হয়েছে। এইজন্যই সমালোচকের ভাষায় তাঁর কাব্য হয়েছে "বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

৭। 'অরণ্যখণ্ডে' বিরাধ বধ, খর-দূষণের যুদ্ধ ইত্যাদি থাকলেও জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধটি প্রাণস্পর্শী হয়েছে। রাবণ সীতাকে চুরি করে আকাশ পথে যখন লঙ্কার উদ্দেশ্যে রথে চড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় জটায়ু পাখী তার দীর্ঘ দুই পাখা দিয়ে রথের গতিতে বাধা দেয়। সীতার করুণ কান্না শুনে 'গরুড়নন্দন' আকাশে পাখা মেলে চারদিক দেখতে থাকে। রাবণকে চিনতে পেরে তার পথ আটকে দেয়। কবির ভাষায়—'দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।' সীতাকে হরণ করার জন্য জটায়ু ভীষণ ক্ষুব্ধ। বৃদ্ধ না হলে বোঁটা থেকে ফলকে যেমন ছিঁড়ে ফেলে তেমনি সে রাবণের মাথা তীক্ষ্ম ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতো। এরপর জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। 'পাখসাট' মেরে 'আঁচড়ে কামড়ে' সে রাবণের রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। তারপর তীব্র বেগে ছোঁ মেরে রাবণের পীঠের মাংস খাবলে নেয়। রথের সারথীর মুণ্ড ঠোঁট দিয়ে ছিন্ন করে। রথের ধ্বজাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে জটায়ু গাছের ডালে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু। রাবণ ও জটায়ুর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ।"

মত্ত হাতী যেমন মাহুতের অঙ্কুশকে অগ্রাহ্য করে, উন্মত্ত হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে—ঠিক তেমনি দুই জনে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে। রাবণের সোনার মুকুটটিকে জটায়ু খান খান করে দেয়। শিবের দয়ার জন্য রাবণের দশমাথা ছিন্ন করতে না পারলেও জটায়ু তার মাথার চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়ে ফেলে। দুই দুই বার যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে রাবণ সীতাকে ভূমিতে রেখে ভাঙা রথ নিয়েই খুব উঁচুতে উঠে বত্রিশ হাজার বাণ জটায়ুর দিকে নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তারপর 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণ' দিয়ে জটায়ুর দুটি পাখা কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

বৃদ্ধ জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন তাতে গা শিউরে উঠে। রাবণের অন্যায় কাজের প্রতিবাদে ও সীতা উদ্ধারের জন্য বিনা অস্ত্রে শুধু পাখা, নখ ও ঠোঁট দিয়ে জটায়ু যেভাবে রাবণকে পর্যুদস্ত করেছে, তার কাছে রাবণের বত্রিশ হাজার বাণ ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা প্রতি আক্রমণ ও প্রতিরোধের রূপটি অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। কবির রাবণের প্রতি ঘৃণা ও জটায়ু পাখীর প্রতি মমত্ববোধে—এই যুদ্ধে জটায়ুর সাহসিকতা—বীরের মতে প্রাণত্যাগ বীররসে মণ্ডিত হয়েছে।

৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক—

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়) — সুকুমার সেন।

২। বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস — ক্ষুদরাম দাস।

একক ৪৫ চৈতন্যভাগবত — বৃন্দাবনদাস — আদিখণ্ড — দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়।

গঠন

৪৫.১ উদ্দেশ্য
৪৫.২ প্রস্তাবনা
৪৫.৩ মূলপাঠ—চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড — বৃন্দাবনদাস। (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়)
৪৫.৪ সারাংশ
৪৫.৫ সারসংক্ষেপ
৪৫.৬ বৃন্দাবনদাসের পরিচিতি ও কবিকৃতি
৪৫.৭ নবদ্বীপ চিত্র
৪৫.৭.১ সমাজ চিত্র
৪৫.৮ চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী
৪৫.৮.১ বাল্যলীলা (৪র্থ অধ্যায়)
৪৫.৯ ব্যাখ্যা-টীকা-শব্দার্থ
৪৫.১০ অনুশীলনী
৪৫.১১ উত্তরমালা
৪৫.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- বাংলা ভাষায় অনূদিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'—এর আদিখণ্ডের মোট ১২ টি অধ্যায়ের মধ্যে যে কটি অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা বর্ণিত হয়েছে সে কটি অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন। তাছাড়া কাব্যখানির আদি-মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা আপনাদের জন্মাবে।
- অনুবাদক হিসাবে বৃন্দাবনদাসের কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করবেন।
- বৃন্দাবনদাসের স্বচ্ছ লৌকিক দৃষ্টি, ঈশ্বরের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি এই দৃষ্টি দিয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষরূপে এঁকেছেন তার পরিচয় পাবেন।
- সমসাময়িক—সামাজিক পরিবেশের চিত্র এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিশেষ করে হোসেন শাহের প্রথম বিশ বছরের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদানও পাবেন।
- ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রের পরিচয় পাবেন।

- ভক্তির আতিশয্য এবং অলৌকিকতায় গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবন দাস পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে যে সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তারও প্রমাণ পাবেন।
- চৈতন্য ভাগবত শুধু চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর তালিকা না হয়ে কেন জীবনাচরণের সঙ্গে দিব্য ভাব জীবনের অধিকারী, নর দেবতার জীবনকাহিনী হয়েছে, সে সম্পর্কে নানা তথ্যাদি পাবেন। যার সাহায্যে নিজেদের ভাষায় নানা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবেন।
- আদিখণ্ডের চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা সংক্রান্ত তিনটি অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙলার ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতির নানা দিগন্ত আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হলো। তা থেকে শ্রীচৈতন্যের লীলাবিষয়ক নানাদিক যেমন পাবেন তেমনি নবদ্বীপের চাল-চিত্রও জানতে পারবেন।
- বাঙলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্য রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে রচিত চৈতন্য কাব্যগুলি। অবতার রূপে পূজিত চৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে কয়েকখানি সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থ ও নাটক, স্তোত্রকাব্য রচিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদাবলীও রচনা করেছেন। এসব বাদে চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে বাঙলা সাহিত্যের সুপরিচিত গ্রন্থাদি হলো—বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গাল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গাল, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয়। তবে আলোচ্য পাঠে সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও চৈতন্য জীবনী গ্রন্থাদির প্রেরণাদাতা বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নিয়ে তাঁর সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাব্যাংশের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪৫.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর 'আদিখণ্ডে'র নবদ্বীপলীলা অংশগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। আদিখণ্ডের ঘটনাবিন্যাস নিম্নরূপ—

১। প্রথম অধ্যায় — মঙ্গলাচরণ ও লীলাসূত্র বর্ণন।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় — শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র জন্মবর্ণন।

৩। তৃতীয় অধ্যায় — নামকরণ ও চাপল্যবিলাসাদি বর্ণন।

৪। চতুর্থ অধ্যায় — শৈশব ক্রীড়া বর্ণন।

৫। পঞ্চম অধ্যায় — শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস বর্ণন।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায় — প্রভুর উপনয়ন ও পাঠাভ্যাসাদি বর্ণন এবং শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থাযাত্রাদি কথন।

৭। সপ্তম অধ্যায় — ঈশ্বর পুরী মিলন।

৮। অষ্টম অধ্যায় — শ্রীগৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বর্ণন।

৯। নবম অধ্যায় — দিগ্‌বিজয়ী বিমোচন।

১০। দশম অধ্যায় — বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচয় বর্ণন।

১১। একাদশ অধ্যায় — শ্রী হরিদাস মহিমাবর্ণন।

১২। দ্বাদশ অধ্যায় — গয়াভূমি গমন বর্ণন।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' তিনখণ্ডে রচিত— ১। আদিখণ্ড, ২। মধ্যখণ্ড, ৩। অন্ত্যখণ্ড।

আদিখণ্ড — শ্রীচৈতন্যদেবের গয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, মধ্যখণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণে পরিসমাপ্তি, অন্ত্যখণ্ডে গৌড়ীয় ভক্তদের মিলন ও গুণ্ডিচাযাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণিত। আদি ও মধ্যখণ্ডটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হলেও অন্ত্যখণ্ডটি যেন হঠাৎ থেমে গেছে। কাব্যখানির এটি একটি ত্রুটি।

তবে আদিখণ্ডের নবদ্বীপে গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা সহজ সরল পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও কৈশোরলীলার বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস বাস্তবতা ও লোকচরিত্রজ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছেন তেমনটি অন্য কোনো চৈতন্যজীবনীকার দিতে পারেননি।

চৈতন্যদেবের জীবনের অধিকাংশ উপাদান গুরুনিত্যানন্দ দাসের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেও আলোচ্য পাঠের চৈতন্যের বাল্য-কিশোরলীলার নানা তথ্যাদি গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছ থেকে হয়তো বৃন্দাবনদাস শুনেছিলেন বলে অনেক গবেষকের ধারণা। তাছাড়া মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কাব্য—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্' যা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত কাব্যগ্রন্থের ভাগবতলীলার প্রভাবও নবদ্বীপ লীলা অংশে দেখা যায়। তাছাড়া এই অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগবত থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম থেকে শৈশবের ক্রীড়াদি বর্ণিত আছে। এই বর্ণনার মধ্যে চৈতন্যের লীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের সমাজ চিত্র, ঐতিহাসিক নানা তথ্যাদির সঙ্গে অলৌকিকতার সমন্বয়ও দেখতে পাবেন। মধ্যযুগের দলিলরূপে চৈতন্য ভাগবত চিহ্নিত। তিনটি অধ্যায় পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা ও তৎকালীন সমাজ জীবনের চালচিত্র নিয়ে ভাবতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবেন।

৪৫.৩ মূলপাঠ ঃ চৈতন্যভাগবত — আদিখণ্ড — বৃন্দাবনদাস (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্ম বর্ণন

জয় জয় জয় প্রভু শ্রীগৌরাসুন্দর।
জয় জগন্নাথ পুত্র মহামহেশ্বর।। ১
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ।। ২
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিল চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।। ৩
পুন ভক্ত সঙ্গে প্রভুপদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার।। ৪
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ।। ৫
অবিজ্ঞাত তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত।। ৬
ব্রহ্মাদির স্ফূর্তি হয় কৃষ্ণর কৃপায়।
সর্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়।। ৭

তাতাহি শ্রীভাগবতে (২। ৪। ২২)—
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাহজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্।। ১

পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে ।। ৮
তবে যবে সর্বভাবে লইয়া শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন।। ৯

তবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপায় স্ফূরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিল সর্ব অবতারস্থিতি।। ১০

হেন কৃষ্ণচন্দ্র দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার।। ১১
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণঅবতার লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা।। ১২

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।১৪।২১)
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবান্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্
ত্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।। ২

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার।। ১৩
তথাপি শ্রীভাগবত গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে।। ১৪

তথাহি শ্রীগীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি
ভগবদ্বাক্যম্ (৪।৭-৮)—
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থ নমর্ধমস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৩
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৪

ধর্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রভাবতা বাঢ়ে দিনে দিনে।। ১৫
সাধুজনরক্ষ বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে।। ১৬

তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গো অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।। ১৭
কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।। ১৮
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার।। ১৯

তথাহি ভাগবতে (১১।৪।৩১-৩২)—
ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদ্বীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।। ৫
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। ৬

কলিযুগে সর্বধর্ম হরিসংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।। ২০
কলিযুগে সংকীর্তনধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্বপরিকরে।। ২১
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্বপরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতর। ২২
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পারিষদ আপ্তগণ।। ২৩
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভায়।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার।। ২৪
কারো জন্ম নবদ্বীপে কারে চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।। ২৫
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন।। ২৬
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।। ২৭
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।। ২৮
সব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে।। ২৯

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত।। ৩০
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণব অবতার।। ৩১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম।। ৩২
চাটিগ্রামে হৈল ইহাঁ সভার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।। ৩৩
রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্।। ৩৪
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ।। ৩৫
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম।। ৩৬
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন।। ৩৭
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল।। ৩৮
তিরোতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্রে বিলাস।। ৩৯
গঙ্গাতীরে পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে।। ৪০
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে।। ৪১
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিৎ।। ৪২
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বাৎসল্য হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।। ৪৩
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার।। ৪৪
শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ।। ৪৫
যে দেশে যে কূলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে।। ৪৬
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়।। ৪৭
অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।। ৪৮
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন।। ৪৯
নবদ্বীপে হইবে প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।। ৫০
নবদ্বীপ হেন গ্রামে ত্রিভুবনে নাঞি।
যদি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।। ৫১
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।। ৫২
নবদ্বীপে সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।। ৫৩
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ।। ৫৪
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।। ৫৫
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।। ৫৬
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।। ৫৭
রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে।। ৫৮
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার।। ৫৯
ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।। ৬০
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন্ জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।। ৬১

ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।। ৬২
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবতী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব।। ৬৩
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি মরে।। ৬৪
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন।। ৬৫
যেবা সব বিবক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি।। ৬৬
অতি বড় সুকৃতী যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।। ৬৭
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।। ৬৮
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।। ৬৯
কেমতে এ জীব সব হইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার।। ৭০
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।। ৭১
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন।। ৭২
সভে মিলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রসাদ।। ৭৩
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য।। ৭৪
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।। ৭৫
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার।। ৭৬
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে।। ৭৭
হুংকার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।। ৭৮
প্রেমের হুংকার তথা শুনি কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে হইলা সাক্ষাৎ।। ৭৯
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য।। ৮০
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়।। ৮১
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।। ৮২
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।। ৮৩
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।। ৮৪
কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহিক সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় সুখ।। ৮৫
স্বভাবেহ অদ্বৈতের কারুণ্য হৃদয়।
জীবে উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।। ৮৬
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।। ৮৭
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞি।। ৮৮
আনিব বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব নাচাইব সব জীব উদ্ধারিয়া।। ৮৯
নিরবধি এইমত সংকল্প করিয়া।
সেবেন কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হৈয়া।। ৯০
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার।। ৯১
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দির হৈল চৈতন্যবিলাস।। ৯২
সর্বকাল চারি ভাই গাই কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান।। ৯৩

নিগুঢ়ে অনেক আরো বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বেই জন্মিল সভে ঈশ্বর আজ্ঞায়।। ৯৪
শ্রীচন্দ্রশেখর গোপীনাথ জগদীশ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস।। ৯৫
একত্রে বলিতে হয় পুস্তক বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার।। ৯৬
সভেই স্বধর্মপর সভেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বিনে কেন না জানয়ে আর।। ৯৭
সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহো না জানেন সব নিজ অবতার।। ৯৮
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার।। ৯৯
কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্তন।। ১০০
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়।
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায়।। ১০১
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন।। ১০২
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে।। ১০৩
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণব গণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।। ১০৪
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্তন।। ১০৫
কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্ররসে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবের হাসে।। ১০৬
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে।। ১০৭
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ কবিরেক গ্রামের উৎসাদ।। ১০৮
মহা তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ অ্যাখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ায়।। ১০৯
কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে।। ১১০
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যাথা যবনে গ্রাম করিবে কবল।। ১১১
এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ।। ১১২
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে।। ১১৩
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।। ১১৪
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া।। ১১৫
যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে।। ১১৬
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস।। ১১৭
এই মত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।। ১১৮
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া।। ১১৯
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন।। ১২০
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহো কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে।। ১২১
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুখে।। ১২২
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ।
অবততিবারে প্রভু করিলা উদ্‌যোগ।। ১২৩
ঈশ্বরআজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম।। ১২৪
মাঘ মাসে শুক্লত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে।। ১২৫

হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা-ব্যজ।। ১২৬
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণপ্রাণ বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যনন্দ নাম।। ১২৭
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন।। ১২৮
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ পুনঃ সুমঙ্গল।। ১২৯
যে পতিতজন নিস্তার করিতে।
অবধূত বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে।। ১৩০
অনন্তের প্রকাশ হৈলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ম অবতীর্ণ যেন মতে।। ১৩১
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো ধর্ম্মেতে তৎপর।। ১৩২
উদার চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা।। ১৩৩
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র।। ১৩৪
তান পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা।। ১৩৫
বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সভে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ।। ১৩৬
বিশ্বরূপমূর্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। ১৩৭
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্তি।। ১৩৮
বিষ্ণুভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল-ভবিষ্য আচার।। ১৩৯
ধর্ম তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিঞা অন্তরে।। ১৪০
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান।। ১৪১
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথমিশ্র শচী শুনে।। ১৪২
মহাতেজমূর্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লিখিতে না পারে অন্য জানে।। ১৪৩
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্ম শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া।। ১৪৪
অতি মহা গোপ্য হয় এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথা।। ১৪৫
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্মে রতি মতি।। ১৪৬
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার।
জয় জয় সংকীর্তন হেতু অবতার।। ১৪৭
জয় জয় বেদ ধর্ম সাধু বিপ্র পাল।
জয় জয় অভক্ত দমন মহাকাল।। ১৪৮
জয় জয় সর্বসত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর।। ১৪৯
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ।। ১৫০
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র।। ১৫১
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে।। ১৫২
তথাপিহ দশরথ বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হই আসি বধে তা সভারে।। ১৫৩
এতেক কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন।। ১৫৪
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্তে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার।। ১৫৫
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্বধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি।। ১৫৬
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি।। ১৫৭

কৃষ্মাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম স্থাপ ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি।। ১৫৮
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম।। ১৫৯
স্রুক্ স্রুব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া।। ১৬০
দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে।। ১৬১
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা করে মহারাজরূপে অবতরি।। ১৬২
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ গোপ্য সংকীর্তন ধর্ম।। ১৬৩
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার।। ১৬৪
মৎসরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্মরূপে তুমি সব জীবের আধার।। ১৬৫
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার।। ১৬৬
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য বিদার।। ১৬৭
বালি ছল অপূর্ব বামনরূপ হই।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী।। ১৬৮
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ-সংহার।
হলধর রূপে কর অনন্ত বিহার।। ১৬৯
বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম করল প্রকাশ।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ। ১৭০
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কর তত্ত্বজ্ঞান।। ১৭১
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান।। ১৭২
সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্মরূপে গোকুলে করিলে বহু রঙ্গে।। ১৭৩
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি।
কীর্তন করিবা সর্বশক্তি পরচারি।। ১৭৪
সংকীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম ভক্তির প্রচার।। ১৭৫
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্বদাস।। ১৭৬
যে তোমার পাদপদ্মধ্যান নিত্য করে।
তা সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে।। ১৭৭
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিগ হয় সুনির্মল।। ১৭৮
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস।। ১৭৯

তথাহি পদ্মপুরাণে—
পদ্ভ্যাং ভূর্মোদশো দৃগ্ভ্যাং
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গালং দিবঃ।
বহুধোৎসার্যতে রাজন্
কৃষ্মভক্তস্য নৃত্যতঃ।। ৭

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষ্যৎ হইয়া।
করিয়া কীর্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।। ১৮০
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবারে কার শক্তি।
তুমি বিলাইয়া বেদ গোপ্য বিষ্মুভক্তি।। ১৮১
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি।। ১৮২
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সভে ইহার কারণ।। ১৮৩
যে তোমার নামে প্রভু সর্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ।। ১৮৪
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সভার দেখিতে ভাগ্য হয়।। ১৮৫
এত দিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে যে চির অভিমত।। ১৮৬

যে তোমারে যোগেশ্বর সভে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে।। ১৮৭
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচীজগন্নাথ গৃহে যথা অবতার।। ১৮৮
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে।। ১৮৯
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ।। ১৯০
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল।। ১৯১
সংকীর্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার।। ১৯২
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়।। ১৯৩
সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গালধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন।। ১৯৪
অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরি বোল হরি বোল বলি সবে ধায়।। ১৯৫
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়।। ১৯৬
অপূর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে নিরন্তর হউক গ্রহণ।। ১৯৭
সভে বোলে আজি বড় বাসিয়া উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ম করিলা প্রকাশ।। ১৯৮
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন।। ১৯৯
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন।
সবে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ।। ২০০
হরি বোল হরি বোল এই সভে শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি।। ২০১
চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ।। ২০২
হেনই সময়ে সর্ব জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।। ২০৩

ধানশী

রাহুকবলইন্দু পরকাশ নামসিন্ধু
কলিমর্দন বান্ধে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ ভুবন চতুর্দশ
জয় জয় পড়িল ঘোষণা।। ১।। ২০৪
হে মাই হে মাই দেখত গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক শোক সব নাশল
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ।।২।। ২০৫
দুন্দুভি বাজে শতশঙ্খ গাজে
বাজয়ে বেণু বিষাণা।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিত্যানন্দ ঠাকুর
বৃন্দাবনদাস রস (গুণ) গানা।। ৩।। ২০৬

ধানশী

জিনিএগা রবিকর অঙ্গ মনোহর
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন ঈষৎ বঙ্কিম
উপমা নাহি বিচারি।। ধ্রু।। ২০৭
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডলে
চৌদিকে শুনিএগ উল্লাস।
এক হরিধ্বনি আব্রহ্ম ভরি শুনি
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ।। ১।। ২০৮
চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর
দোলয়ে তাঁহা বনমাল।
চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখণ্ডল
আজানু বাহু বিশাল।। ২।। ২০৯